প্রকল্পে প্রকল্পে সাজানো

আমার সোনার বাংলা

র‍্যাজ্যের সফল প্রকল্পগুলি নিয়ে **অজিতেশ করের** চিত্রে ও বিভাগীয় সম্পাদকীয় শাখার আধিকারিকদের লেখায় এই প্রকাশনাটি প্রস্তুত করা হল।

ঘরের দিদি মুখ্যমন্ত্রী

এই প্রথম ঘরের দিদি মুখ্যমন্ত্রী। কাঁকড়াঝোড়ের অমল মুর্মুর আনন্দ আর ধরে না। ঘরে ঘরে আলো, বিশুদ্ধ খাবার জল। আবার শুরু হল স্কুল যাওয়া। বই, খাতা, ব্যাগ, জামা, জুতো, খাওয়া। তারপর সবুজ সাথীর সাইকেল। বড়দিদির কন্যাশ্রী-র টাকা। শিক্ষাশ্রী-র টাকাও পাচ্ছে অমল। হাঁড়িতে সবসময়ই দু-টাকা কেজি চাল, আটা। মুখ শুকনো করে আর পেটে খিদে নিয়ে ঘুরতে হয় না অমলকে। অমলের হারাম্বা অর্থাৎ দাদু ও বুড়িগ অর্থাৎ ঠাকুমা দুজনেই বার্ধক্যভাতাও পাচ্ছেন। জঙ্গলমহলের দুঃস্বপ্ন শেষ হয়েছে। অমল ভাবে, এখানে তখন অপদেবতা ভর করেছিল।

এখন কত খুশিতে সকলে মাদল বাজায়, নাচে, ফুটবল খেলে। রাস্তাঘাট কত ভালো হয়ে গিয়েছে। বাইরে থেকে কত মানুষ আসে 'জঙ্গলমহল'-এ ঘুরতে। জোছনা রাতে অপরূপ হয়ে ওঠে অমলদের গ্রামও। হাতির আনাগোনা আছে এখানে। তবু এখন কত না সুখে দিন কাটে অমলদের।

দিদির জন্যই অমলদের এই সুখ, শান্তি। ওই খারাপ মানুষগুলো কত যন্ত্রণা দিয়েছে এই জঙ্গলমহলের মানুষদের। এত অত্যাচার ভাবা যায় না। দিদির ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে অমল। ওদের জীবনে অন্ধকার দূর হয়েছে। দিদি জিতেছে লড়াইয়ে। দিদির সঙ্গে ওরাও লড়াই-এ সাড়া দিয়েছে। শান্তির জন্য সবসময় ওরা দিদির সঙ্গে রয়েছে। থাকবে।

কন্যাশ্রীরাই নতুন যোদ্ধা

মেয়েদের আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে 'কন্যাশ্রী'। বিশ্বজুড়ে তাই 'কন্যাশ্রী'-র জয়জয়কার। মমতাদিদি মেয়েদের চোখের সামনের কালো পর্দাটা একটানে সরিয়ে দিয়েছেন।

এতদিন মেয়ে মানেই যেন হেলাফেলার বস্তু। ঘরের কোণে ফেলে রাখা একমুঠো ধুলো। তার আবার শখ-আহ্লাদ, স্বাধীনতা, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর স্বপ্ন। তাও কি হয়? যত পারো ওকে দিয়ে ঘরের কাজ করাও আর তাড়াতাড়ি পাত্রস্থ করে পরের ঘরে বিদেয় কর। এই তো ছিল মেয়েদের চিরন্তন জীবনগাথা। কতজনের দিন গেল এভাবেই। কেউ তো ভাবেনি! আপত্তি করেনি! হয়তো চোখের জল ফেলেছে কেউ কিন্তু প্রতিবাদ? কী হবে সে সব করে? কে ভাবে ওই এককোঁটা মেয়ের মনের মেঘ-রোদ্দুর নিয়ে? ভাবলেন যিনি তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন—স্কুলে পড়াশোনা চালিয়ে গেলে ১৩ থেকে ১৮-র মেয়েরা পাবে বছরে ১০০০ টাকা করে।

১৮-র বেশি আবার ১৯-এর কম বয়স যে মেয়েদের তারা অবিবাহিত থেকে পড়াশোনা চালিয়ে গেলে পাবে এককালীন ২৫ হাজার টাকা। আর তারও পরে? স্নাতকস্তরে মাসে আড়াই হাজার টাকা বিজ্ঞান বিভাগের মেয়েদের জন্য। আর কলা বিভাগের জন্য মাসে ২ হাজার।

এরাই এ রাজ্যের নতুন যোদ্ধা, এরাই মুখ্যমন্ত্রীর সাধের কন্যাশ্রী বর্তমানে যাদের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ। এতে একদিকে যেমন ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত বিয়েটা ঠেকিয়ে রাখা গেল, তেমনই মেয়েটার সামাজিক আর অর্থনৈতিক ভিতও নড়বড়ে রইল না। তারই অ্যাকাউন্টে টাকা আসে, নিজের সিদ্ধান্তে দরকারে সংসারে দুটো পয়সা তো সেও দিতে পারবে। গুরুত্ব পাবে তারও মতামত। আবার অন্যদিকে মা হওয়ার আগে সময় পাবে নিজের শরীর ও মন গড়ে নেওয়ার। আর হয়তো এভাবেই একদিন দূর হবে ছেলেবেলায় বিয়ের ছেলেখেলা। কারণ, বিয়ের এই অকালবোধনই একটি মেয়ের জীবনে ডেকে আনে সর্বনাশ, বহুক্ষেত্রেই তারা হয় পাচারকারীদেরও শিকার।

কন্যাশ্রী প্রকল্প তাই শুধু বয়ঃসন্ধির মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এনে দিয়েছে তা নয়—বেড়েছে মেয়েদের আত্মমর্যাদাবোধ। আমূল বদলে গিয়েছে তাদের চিন্তাধারা। তৈরি হয়েছে কন্যাশ্রী ক্লাব। স্কুলের মেয়েদের জন্য একটা নিরাপদ প্ল্যাটফর্ম। যেখানে তারা নিজেদের সমস্যা, আশঙ্কা, অভিজ্ঞতা অন্যের সঙ্গে মন খুলে ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ পায়।

আর এই ভাগ করে নেওয়াই যেন বদলে দিয়েছে তাদের—জোর দিয়েছে নিজেদের ভালোর জন্য সমাজের খারাপ দিনগুলোর পরিবর্তন চাইতে।

বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাবালিকাদের বাবা-মায়ের মন বদলে দিচ্ছে তারা। তরুণ তুর্কিদের যুক্তির কাছে হার মানছে সব বাধাই। ১৮-র আগে আর বিয়ে নয়। কন্যাশ্রীরা আজ অটল।

খাদ্যসাথী

তিনটে পাহাড় ডিঙিয়ে পিপিং সুব্বাকে রেশনের চাল আনতে যেতে হত। এখন বাড়ির সামনেই দোকান হয়েছে। আবার দু-টাকাতেই এক কেজি চাল। কত দিন না খেয়ে কেটেছে। একের পর এক চা-বাগান বন্ধ হয়ে গেল। কেউ ভাবল না ওদের কথা। বৃদ্ধ বাপটা এত বছর চা-বাগিচায় কাজ করে শেষে বিনা চিকিৎসায়, প্রায় অনাহারে মারা গেল। প্রায় দশ বছর হয়ে গেল। আজও ভোলেনি, আজও ভোলা যায় না। পিপিং-এর মনে বড় ব্যথা। বুড়ি মাকে পিপিং খুব যত্ন করে খাওয়ায়। একের পর এক বন্ধ চা-বাগানের মানুষের মুখে খাবার তুলে দিচ্ছে দিদির 'খাদ্যসাথী'। পাহাড় তো হাসছে, হাসছে জঙ্গলমহল। হাসছে বন্ধ চা-বাগানের বসতির মানুষও।

বিদু সোরেন, কালু মণ্ডল, রহিম শেখ, দীনু চ্যাটার্জি—সকলের মুখেই হাসি। খিদের সময় মুখে দুটো অন্ন জুটবে। আর কী চাই।

রেশন দোকানে লাইনে দাঁড়িয়ে সেকথাই বলাবলি করছিলেন ওঁরা। বেণীপুকুর গ্রামে গরিব মানুষের মুখে মুখে মুখ্যমন্ত্রীর নাম। এই বয়স্ক মানুষগুলো কোনোদিন ভাবেনি দু-টাকা দিলে এক কেজি চাল পাওয়া যাবে।

পুরুলিয়ার এই প্রত্যন্ত গ্রামে দু-পয়সা রোজগারের সুযোগ মেলে না। গরু, ছাগলও পোষা যায় না। গরমে বড়ো জলের কষ্ট। প্রাণীদের কষ্ট চোখে দেখা যায় না।

বেণীপুকুরের অনেক পাড়াতেই অপুষ্ট মা ও শিশু। তাদের জন্য বিনা পয়সায় প্রতি মাসে চাল, গম, মুসুর ডাল, ছোলা দেওয়া হয়। দীনু চ্যাটার্জি রহিম শেখকে বলতে থাকে—ভাগ্যিস দিদি 'খাদ্যসাথী' চালু করেছিল। রহিম ভাই, তাই তো রাজ্যের এই সুদিনটা দেখতে পাচ্ছি।

কৃষি বিপণনের রোজনামচায় আমূল পরিবর্তন

সুফল বাংলা বোলপুর তথা শান্তিনিকেতনের জীবনছন্দই যেন পালটে ফেলল।

এ যেন সত্যিই নতুন বীরভূম।

সকালে চায়ের কাপ নিয়ে বাগানে বসে সোমরাজ www.sufalbangla-র ওয়েবসাইটে সবজি ও মাছের দামটা দেখে নেয়। তারপর বোলপুরের সুফল বাংলা বিপণিতে অর্ডারটা দিয়ে দেয়।

শান্তিনিকেতনে পূর্বপল্লীর বাড়িতে আগে কেউ আসতে চাইত না। এখানে বাজারের বড়ো সমস্যা ছিল। আর এখন সুফল বাংলার দৌলতে ছুটি কাটাবার জন্য সোমরাজের ভাই-বোনেরা প্রায়ই চলে আসে।

কালো চাল ও প্রথম এই বিপণি থেকেই কেনে। গ্রাম-গঞ্জের মানুষেরা তাদের খেতের ফসল নিয়ে দিয়ে যায় এখানে। সরকারি বিপণনের এমন পরিকাঠামো গড়ে তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী যা মনকে ভরিয়ে দেয়। জীবনযাপনে কত স্বাচ্ছন্দ্য চলে এসেছে। বাবা-মার কথা মনে পড়ে সোমরাজের। ওরাও এখন এখানে থাকলে কত আনন্দ পেতেন। মাঝে মাঝে শ্রীনিকেতনের ওদিকের কৃষকবাজারটাতেও চলে যায় সোমরাজ আর রিতা। সবজি, মাছ সবই নিয়ে আসে ব্যাগ ভরতি করে।

ক-দিন আগে এমনি করেই চলে গিয়েছিল বোলপুরের সুফল বাংলার বিপণিতে। হঠাৎই দুজন সাঁওতালি রমণী ঢুকল। একজনের মাথায় লাল শাকের আঁটি, আরেকজনের মাথায় ঘরে ভাজা মুড়ির বস্তা। রিতা গিয়ে আলাপ জমাল ওদের সঙ্গে। গোয়ালপাড়ার সুখী মান্ডি আর ছবি মুর্মু। সুখীর বাড়ির উঠোনের লাল শাক আর ছবির ঘরে ভাজা মুড়ি নিয়ে ঘরে ফিরল ওরা।

এক ছাতার তলায় এমন বিপণি ওরা অনেক দেখেছে। কিন্তু সুখী বা ছবিদের এমন যুক্ত হয়ে পড়া—ভাবেনি কখনো।

রিতা বড়ির প্যাকেটটা হাতে তুলে নিয়ে দেখল, পড়ল নামটা। মমতা স্বনির্ভর দল। মুচকি হাসল। সার্থক নাম। গোটা বাংলাই যেন এই নামটা নিয়ে নিয়েছে।

মাথার ওপর ছাদ

কেউ থাকে বস্তিতে, কেউ বা সরকারি জমি দখল করে, বা রেললাইনের ধারে অথবা ভাড়া বাড়িতে কষ্টসৃষ্টে। বড়ো স্বপ্ন—নিজের যদি একটা আশ্রয় থাকত।

মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু সকলেরই দরকার। শান্তিপুরের শংকর ভদ্রের মতো মানুষও গীতাঞ্জলি প্রকল্পে বাড়ি পেয়েছে। এক রাতে গঙ্গায় ভেঙে যায় তাঁর পৈতৃক দোতলা বাড়ি। চাকদহের জমিতে সরকারের টাকায় ঘর করেছে সে। জমিটুকু না থাকলে ঘর হত না।

যাদের নিজেদের জমি নেই তাদের কথাও ভেবেছে সরকার। তাদের জন্য তৈরি হচ্ছে 'বাংলার বাড়ি', চারতলা ফ্ল্যাট।

নকড়ি হালদার ভাবতে পারেনি কখনো ফ্ল্যাটে থাকবে। আজ সব সম্ভব।

মাথার ওপর একটু ছাদ। নিশ্চিন্তে, নিরাপদে দিনযাপন। সঙ্গে সুন্দর জীবনের নানা সুবিধা। বাঁচার ইচ্ছেটা এভাবেই বাড়িয়ে দিচ্ছেন দিদি --- বিরাশি বছরের নকড়ি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে।

যুবশ্রী

মাসে মাসে 'যুবশ্রী'-র ১৫০০ টাকা তপনের জীবনটাকে পাল্টে দিল। দামি জামাকাপড় আর মোবাইল কিনে টাকাটা নষ্ট করেনি ও। ওই টাকা দিয়ে ডিটিপি-র কোর্সটা করে ব্যবসা শুরু করেছে তপন। চাকরির বয়সটা পেরিয়ে গিয়েছিল। চরম হতাশায় ডুবে যাচ্ছিল সোদপুরের ঘোলার বাসিন্দা তপন আদক। নেই মনের মতো কাজ। নেই ব্যবসা করার টাকা। যুবশ্রী-ই ওর ভাগ্য ফেরাল। ওই সময় মাসে মাসে ওই টাকাটুকু দেবারও তো কেউ ছিল না। এইভাবেই কত মানুষের জীবন গড়ে দেবে সরকার। সেদিন ভাত খেতে খেতে তপন মাকে বলছিল—'মানুষের সরকার' শব্দটার মানে আমি প্রতিদিন এখন বুঝতে পারি মা। তপনের চোখের জল খাবার থালায় পড়ছিল। মা বললেন, খাবার সময় চোখের জল ফেলতে নেই।

নিজের জমিতে নিজের ঘর

পাট্টার কাগজটা বুকে জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কেঁদে চলে প্রতিমা বাড়ুজ্যে। দেশভাগের জ্বালা এতদিনে যেন জুড়োল। রেললাইনের ধারে ধারেই জীবন কেটেছে। ঘর, সংসার সব চলেছে বেড়ার ঘরে।

ছোটো ছেলের বৌয়ের চেষ্টায় এই পাট্টার কাগজটা আজ হাতে এল। সরকার জমি দেবে, ঘর করার টাকা দেবে, জল-আলো-রাস্তার ব্যবস্থা করবে, পুকুর কেটে মাছের চাষ হবে, হাতের কাজ শেখাবে। ঘরের সঙ্গে থাকবে জমি। আবার সবজি ফলাবে যেমন ছোটোবেলায় ওদেশে বাবাকে দেখেছিল।

প্রতিমা দেবী ভেবেছে এক কোণে একটা মনসা মন্দির বানাবে। বহুদিনের শখ, মনসার গান গেয়ে গেয়ে তো ট্রেনে পয়সা চাইত একসময়।

আবার নতুন বসতি হবে! বুকটা দুরদুর করে। ছোটো বৌমা অতসীকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করে—কে আমাদের কথা ভাবল রে!

দিদিগো দিদি। এমন করে কে আর ভাবতে পারে বলো।

সবুজশ্রী

সুলেখা মিস্ত্রির হাতে বন দপ্তর পুরস্কার তুলে দিল।

পঞ্চায়েত প্রধান সুলেখা কোনোদিন ভাবতেই পারেনি এমনটা হতে পারে। এটা তো ছিল ওর কাজ। কাজটাই করে গিয়েছে ও। তবে একা নয়। সকলকে নিয়ে।

এই পঞ্চায়েতে যত শিশু জন্মেছে তাদের প্রত্যেকের নামে একটা করে গাছ পোঁতা হয়েছে। আর ওদের বাবা-মাকে নিয়ে প্রতিটি গাছ পরম যত্নে বড়ো করেছে সুলেখা। একটি গাছও মরেনি। শুধু কি বাঁচানো। নিয়মিত জল দেওয়া, সার দেওয়া, বেড়া ঠিক করা।

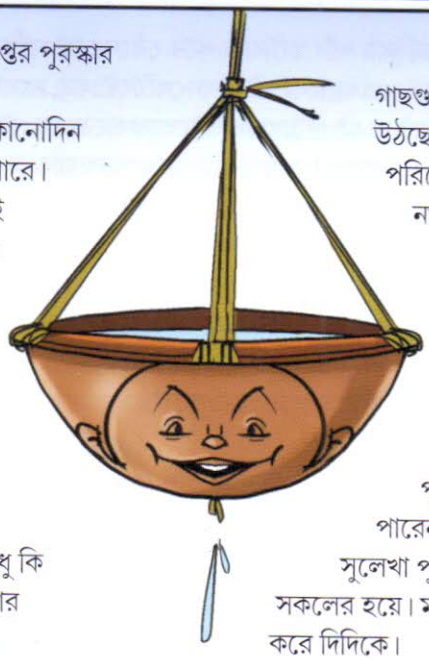

বাচ্চাগুলোও বাড়ছে। গাছগুলোও বাড়ছে। সেজে উঠছে পঞ্চায়েতটা। বিশুদ্ধ হচ্ছে পরিবেশ। সবুজশ্রী প্রকল্প তো নতুন করে সবুজ বাংলা গড়বে। দিদির এই ভাবনার সঙ্গে সকলে কেমন যুক্ত হয়ে গিয়েছে।

একটি শিশুর জন্ম মানেই একটি গাছ পাবে পৃথিবী। সত্যিই দিদি ভাবতে পারেন বটে।

সুলেখা পুরস্কার নেয় পঞ্চায়েতের সকলের হয়ে। মনে মনে পুরস্কারটি উৎসর্গ করে দিদিকে।

১০০ দিনের কাজ

মিনতি টিভির খবরে শুনেছে পশ্চিমবঙ্গ ১০০ দিনের কাজে সারা ভারতে প্রথম হয়েছে। ১০০ দিনের কাজ পেয়ে মিনতির মতো বাংলার গ্রামে গ্রামে দরিদ্র পরিবারে বহু মানুষ জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে। তিন মেয়ের মা, মিনতি সর্দার আজ দশ বছর ধরে স্বামীহারা। লোকের বাড়ির কাজই ছিল সম্বল। তিন মেয়েকেই স্কুলে পড়াচ্ছে। এখন ১০০ দিনের কাজ কিছুটা দিন ফিরিয়েছে। গ্রামের বড়ো পুকুরটা মিনতির গ্রামের লোকেরাই কেটেছে। ওই পুকুর এখন ওদের প্রাণ। পুকুরের টলটলে জল দেখে মনটা ভরে যায়। গ্রামে এখন সকলেরই ঘরের পাশে শৌচালয়। সেজন্য পুকুরপাড় এখন পরিষ্কার।

গ্রামের মেয়েরা ১০০ দিনের কাজে এখন পুষ্টিবাগান তৈরি করছে, বনসৃজন করছে। পঞ্চায়েতের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে গ্রামের মানুষ গ্রামটাকেই পাল্টে দিল। মিনতিদেরও জীবন পাল্টে যাচ্ছে। মিনতি ভাবে সত্যিই একদিন ১০০ দিনের কাজে সবকটি গ্রামই ওদের গ্রামের মতো পাল্টে যাবে। বিশুদ্ধ খাবার জল, পাকা ও ঢালাই রাস্তা, ঘরে ও রাস্তায় আলো এসব তো আছেই। সঙ্গে আছে রাস্তা জুড়ে সাইকেল চড়ে ছেলেমেয়েদের পড়তে যাওয়া, খেলতে যাওয়া।

ঘরে ঘরে স্বনির্ভর হওয়ার স্বপ্ন ডানা মেলছে। মিনতি বেজায় খুশি।

এ রাজ্যের চাষির আয় বেড়েছে ৩ গুণেরও বেশি

এ রাজ্যে চাষির আয় বেড়েছে তিনগুণেরও বেশি। বাংলায় চাষবাসই তো বাংলাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই বাংলার চাষিকে ভালোভাবে বাঁচাতে হবে। উন্নত চাষই বাংলার উন্নতির মূলে। সবুজ বাংলার বুক জুড়ে তাই বছরভর 'মাটি-উৎসব' যেন। দিদি তো সরকারের নামই দিলেন মা-মাটি-মানুষের সরকার। চাষবাস এর আগে এত সম্মান কখনো পায়নি। এত সুযোগও পায়নি চাষিরা।

চাষের জমিটুকু প্রাণভরে বেচার কথা কোনোদিনও ভাবেননি সমীর মণ্ডল। ভেবেছিলেন বুড়ো বয়সে যখন কাজ করার শক্তি থাকবে না, খাবার জুটবে না তখন ওইটুকু তো সম্বল। বৃদ্ধ সমীর মণ্ডলের মুখে এখন হাসি আর ধরে না। ঘরে বসে কৃষকভাতার টাকা পাচ্ছেন তিনি। বড়ো ছেলে এম.এ. পাশ করেও জমিতে জৈবসার দিয়ে চাষ করছে। ছোটো ছেলে চাষের জন্য কিষান ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা পাচ্ছে। যন্ত্রপাতি কেনার টাকাও পেয়েছে। পেয়েছে পেঁয়াজের গোলা করার জন্য টাকা। জমি থেকে ফসল নিয়ে বাজারে বেচতে যাওয়ার জন্য চাতাল তৈরির টাকাও পেয়েছে। কিছু দূরেই তৈরি হয়েছে কৃষকবাজার। জমির ফসল নিয়ে গিয়ে বেচে আসছে ছোটো বউমা। ধান তো কিনে নিচ্ছে সরকার। ব্যাঙ্কে জমা হচ্ছে টাকা। জমিটুকু রাখতে পেরেছিলেন বলেই আজ এতবড়ো পরিবার নিয়ে আনন্দে আছেন। সবার হাতেই কাজ। সবাই মিলেই আয় করছেন। জমিই তো আসল মা—সমীর মণ্ডল কেবলই একথা ভাবে। মা, মাটি আর মানুষ—দেশকে তো এরাই এগিয়ে নিয়ে যায়। মাটি যাঁদের মা সেই মানুষগুলোর কথাকেই তো সবচেয়ে বেশি সম্মান দেওয়া হয়েছে এই সাত বছরে। তাই তো চাষির আয় বেড়েছে তিনগুণেরও বেশি আজ যা কেন্দ্রের লক্ষ্য। বাংলা চিরকালই এভাবে সবার আগে থাকুক— আকাশের দিকে তাকিয়ে সমীর মণ্ডল প্রার্থনা করে।

গতিধারা

উপল, সৌমেন, অজিতেশদের জীবনধারাই বদলে দিল 'গতিধারা'। তিন বন্ধুই ঠিক করে ফেলল স্বাধীন ব্যবসাই করবে তারা। কিনে ফেলল গাড়ি। গতিধারা প্রকল্পের ভর্তুকির সুবিধা নিয়ে। সরকার দিল ভর্তুকি হিসাবে এক লক্ষ টাকা। যুবশ্রীর ভাতা নিয়ে কলেজের পড়াশোনার পাশাপাশি ড্রাইভিংটাও শিখেছিল ওরা।

প্রতিবেশী দাদা আমেরিকা পাড়ি দিচ্ছে। মাঝরাতে বালিগঞ্জ থেকে তাঁকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতে চলেছে উপল। মা ফ্লাইওভার দিয়ে গাড়ি ছুটছে। রাতের আলোয় ঝলমলে শহর। উপলের চোখে ভেসে উঠছে স্বপ্নদেখা দিদির মুখ। মহানগরীর এই প্রান্ত আজ তাঁরই জন্য এত মোহময়ী। তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেজে ওঠা শহরের বুকে উপলদের 'গতিধারা' অনেকের স্বপ্নকেই সার্থক করে তুলেছে দিদির সঙ্গে সঙ্গে। তিনি তাদের কাছে সত্যিই নতুন পথের দিশারী।

দল বেঁধে ওরা এগিয়ে চলেছে আনন্দধারায়

ঘরকন্যা সামলে অনিতা, রূপালী, শোভনারা সময় বের করে নেয়। দুপুরের কাজের পর ওরা সেলাই নিয়ে বসে। হাতে, মেশিনে নানারকম পোশাক তৈরি করে। কেউ কিনে আনে কাঁচামাল, কেউ রাখে হিসেব, কেউ শেখায়, কেউ আবার বাজারে যায় তৈরি পোশাক নিয়ে। খুঁটিনাটি আরও কত না কাজ। দিদি আবার সাইকেল দিয়েছেন ওদের। রাজ্যের মেয়েদের দিদি যেভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন ওদের কাছে সেটাই বড়ো প্রেরণা। মেয়ে হয়ে দিদিও তো রাজ্য চালাচ্ছেন। ওরাই বা দল চালাতে, ব্যবসা চালাতে পারবে না কেন !

আনন্দধারা। দিদির রাখা নামটা ওদের খুব পছন্দ। এই স্বনির্ভর দল গঠন যেন ওদের জীবনে মুক্তির ডাক নিয়ে এসেছে। কত রকম সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে ওরা এবং ওদের পরিবারের সকলে। রাজ্যে মেয়েদের জীবনে সত্যিই পরিবর্তন এসেছে। এটাই তো সকলে চাইছিল।

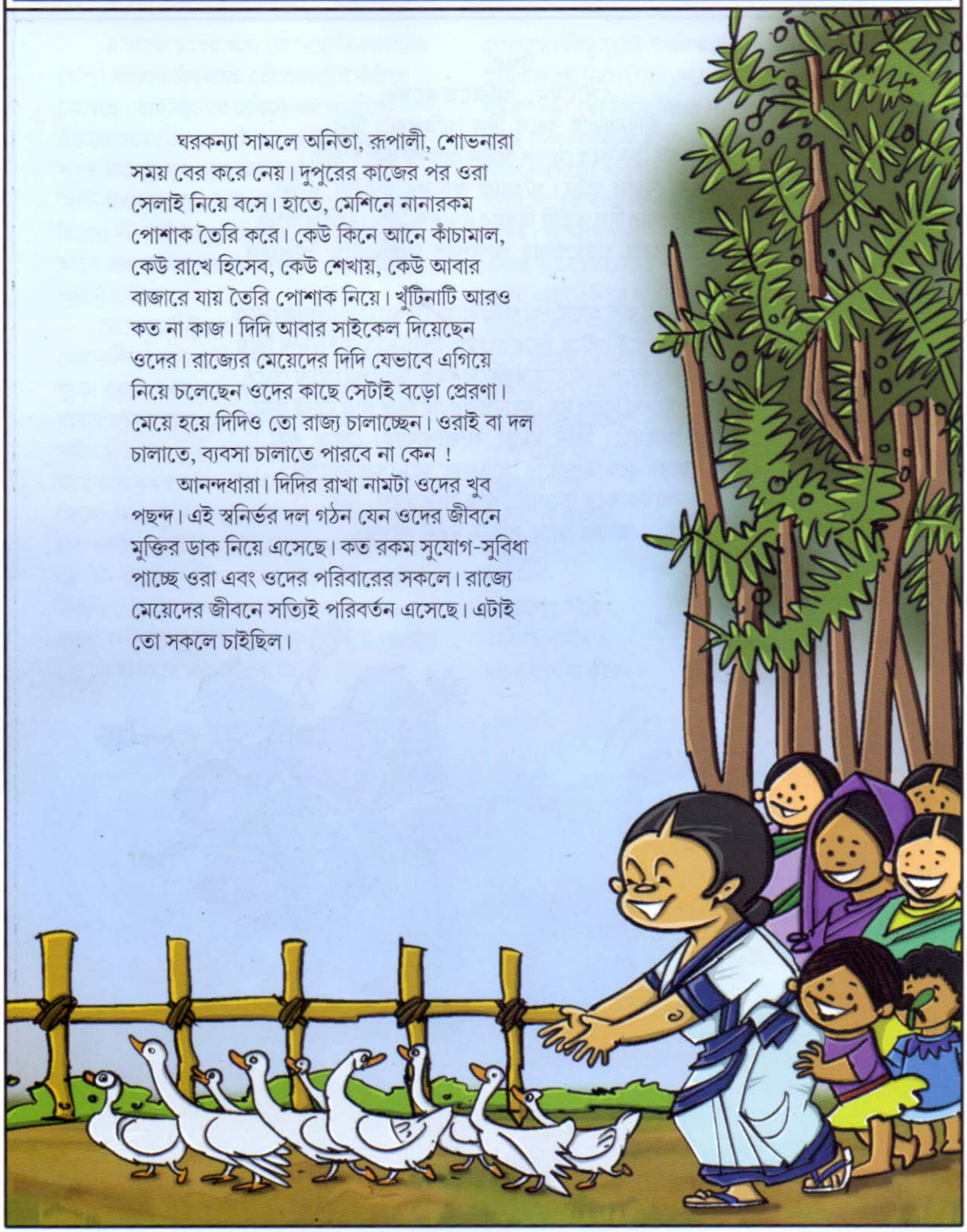

সমব্যথী

মৃত স্বামীকে ছুঁয়ে বসে আছেন বাহাত্তর বছরের নমিতা দাস। নিঃসন্তান এই দম্পতির সংসার চলতো ব্যাঙ্কের টাকার সুদে। মাসের মাঝে স্বামীর হঠাৎ মৃত্যু। হাত একেবারে ফাঁকা। ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বছর ছাব্বিশের শীলা মৈত্র। পাশে এসে বসল। হাতে গুঁজে দিল দু-হাজার টাকা। পাড়ার মেয়ে। নমিতা জেঠির আপদ-বিপদে চিরকালই ছুটে এসেছে। কিন্তু এমন সময়ে এত টাকা নিয়ে! জেঠিমা কিছু বলার আগেই শীলা বলে উঠল, এ টাকা তোমার প্রাপ্য জেঠিমা। 'সমব্যথী' প্রকল্পে তুমি দু-হাজার টাকা পাবে। তখন আমায় শোধ করে দিও। 'সমব্যথী! সেটা কি?'—নমিতা জেঠিমার অবাক প্রশ্ন।

এইসব বিপদ তো যখন-তখন এসে পড়ে। বলে-কয়ে তো আসে না। তাই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতাদিদি ঠিক করেছেন, কেউ মারা গেলে অভাবী মানুষদের হাতে দাহ করার জন্য দু-হাজার টাকা করে দেবেন। তোমার আধার কার্ডের জেরক্সটা আমায় দাও। ওটা লাগবে।

বেঁচে থাকুক তোমাদের দিদি। আশীর্বাদ করি তাঁকে। মানুষের জন্য তাঁর এত ভাবনা। ফাঁকা হাতে বসে আমি তো ভাবছিলাম শীলা মা, কি করে তোমার জেঠুকে শ্মশানে নিয়ে যাব। ঈশ্বর তাঁকেই আমাদের কাছে পাঠালেন।

স্বামীর পায়ে মাথা রেখে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—দেখো গো, আমাদের এই বিপদ থেকে রক্ষা করলেন কে ? সত্যিই তিনি 'সমব্যথী'।

বৈতরণী

ঝড়-জলের রাত। বাবাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার লোক পাওয়া ভার। সুজিতের কয়েকজন বন্ধু এসেছে। স্বর্গরথ-এর ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু পোড়ানো শেষ না হওয়া পর্যন্ত শ্মশানে থাকবে কি করে। সুজিত ওদের চলে যেতে বলল। কিন্তু কেউ গেল না। সুজিত বুঝল, এই জন্যই বলে শ্মশানবন্ধুই প্রকৃত বন্ধু।

আলোয় আলোয় জেগে আছে শ্মশান। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘরে বসার জায়গা। গান বাজছে—আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু। গীতাপাঠের সিডি বাজছে। বাবাকে ছাড়ার জন্য মনে মনে তৈরি হয়ে উঠল একমাত্র সন্তান সুজিত। মাকে অনেকদিন আগেই হারিয়েছে। বাবাকে বৈতরণী পার করে দেবে। সুজিতের এ যেন আরেক অভিজ্ঞতা। এত সুন্দর একটা পরিবেশ তৈরি হতে পারে শ্মশানে—এ যেন ভাবা যায় না। শেয়াল-ডাকা গঙ্গাপারের শ্মশান, গা ছমছমে অনুভূতি, স্বজনহারানোর যন্ত্রণায় আর্ত চিৎকার। সব উধাও। যেন এক স্বর্গীয় অনুভূতি।

বাবাকে আরেক জীবনলোকে পৌঁছে দিতে এসেছে সুজিত। সঙ্গে আছে বন্ধুরা। সকলেরই একই অভিজ্ঞতা। বাবার নাভি-মণ্ডলী গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে কাছা-পরা সুজিত উঠে আসছে সিঁড়ি বেয়ে।

গান বাজছে—আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু....

কানে বাজছে—বাসাংসি জীর্ণানি....

বাঙ্গালোরের মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির পদস্থ অধিকর্তা সুজিতের স্বগত উচ্চারণ—সাবাস দিদি !

বাংলাই পারে এভাবে ভাবতে।

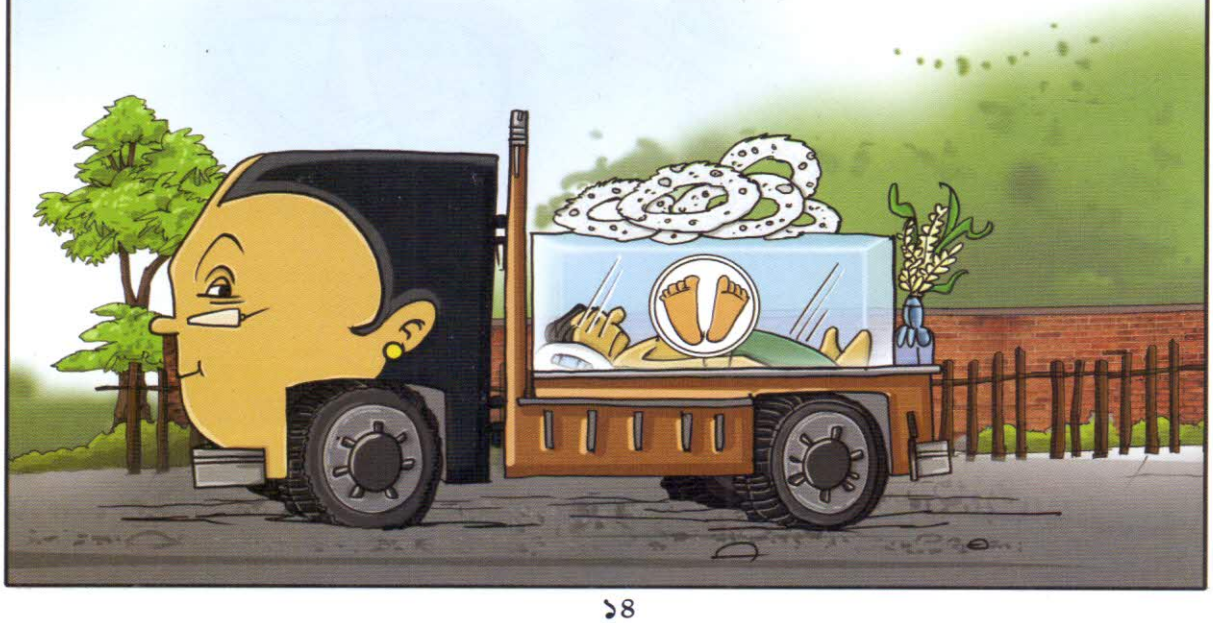

পায়ে দাও জুতো

মনের চোখে দেখেন তিনি। তিনি তাই বাংলার ঘরে সকলের দিদি। এই দিদি যাবে গাঁয়ের পাশ দিয়ে। স্কুলের ছোট্ট ছেলেমেয়েরা শুনেই দৌড়। দিদি, দিদি, দিদি....।

ওদের চিৎকারে দাঁড়িয়ে গেল দিদির কনভয়। মুখ্যমন্ত্রী নেমে এলেন ওদের কাছে। কচি কচি হাতগুলো ওরা বাড়িয়ে দিয়েছে। দিদির সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। মনটা মোচড় দিয়ে উঠল, খালি পা ওদের। কাঁকর-বিছানো পথে ওরা ছুটে আসছে।

পাশে থাকা সচিবকে নির্দেশ দিলেন—সব ছাত্রছাত্রীর জন্য অবিলম্বে জুতোর ব্যবস্থা করুন।

ভারী মন নিয়ে গাড়িতে উঠে এলেন। পুরোটা পথ তিনি ভেবে গেলেন—

খালি পায়ে কিভাবে ওরা ফিরে যাচ্ছে স্কুলে!

শুধু শিক্ষা বা মিড-ডে মিলই নয়, ওদের জন্য অনেক কিছু করতে হবে।

শিশু আলয়

ছুটব, খেলব, হাসব। এভাবেই বেড়ে উঠবে শিশুরা। কিন্তু মাঝে মাঝেই তো শোনা যায়, পুরোনো গোয়ালঘরেও বসছে অঙ্গনওয়ারির শিশুরা। কখনো বা লোকের উঠোনে, ভাঙা বারান্দায়, গাছের তলে।

শুধু কি একটি ঘর ! তাহলেই কি মিটবে ওদের প্রয়োজন ?

না।

এইসব নানা প্রশ্নে মমতা ব্যানার্জি নিজেই কাতর হয়ে পড়েন।

শিশুর জন্য চাই স্বপ্নের জগৎ। আনন্দের জগৎ। সব কটি পাপড়ি মেলে যেন ওরা ফুটে উঠতে পারে। বাংলার নানা প্রান্তে গড়ে উঠল 'শিশু আলয়'—শিশুর ঘর। দেওয়াল জোড়া বর্ণপরিচয়। পাখি, প্রজাপতি, বাঘ, ময়ূরের ছবি। সামনে দোলনা। বাহারি বাগান।

পাশ দিয়ে গেলে শোনা যাবে—শিশুর কলকল আওয়াজ—ছুটব, খেলব, হাসব।

শিশুদের মায়েরা ভাবে—দিদি, আমাদের চেয়েও বেশি ভাবে আমাদের বাচ্চাদের জন্য। টুসকি সর্দার মনে মনে বলে—ফুলে ছাপটা তাহলে ঠিকঠাকই ছিল।

উৎকর্ষ বাংলা

সুমনার বাবার ছোট্ট চায়ের দোকান রাস্তার পাশেই। শ্যামনগর স্টেশনের কাছে। মা হঠাৎ মারা যাওয়ায় মাঝপথে পড়াশোনাটা থেমে যায়। কিন্তু ইচ্ছে ছিল নিজের পায়ে দাঁড়ানোর। মোবাইল সারানোর ট্রেনিং-এর সুযোগ এসে গেল। বিনা পয়সায়। তারপর বাবার দোকানের এক পাশেই খুলে ফেলল মোবাইল সারানোর দোকান।

কয়েক মাসেই সুমনার নাওয়া-খাওয়া মাথায় উঠল। এত কাজ আসবে ভাবতেই পারেনি।

সুমনার মতো অনেক ছেলেমেয়েই পড়াশোনা শেষ করতে পারেনি। ডিঙোতে পারেনি স্কুলের চৌকাঠ। তাদের জন্যই সরকার প্রশিক্ষণ চালু করেছে—উৎকর্ষ বাংলা। হাতে-কলমে কাজ শিখিয়ে বাংলার ঘরে ঘরে স্বনির্ভর ছেলে-মেয়ে তৈরি করাই উদ্দেশ্য।

সল্টলেকের কারিগরি ভবনের সঙ্গে কতজনকে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছে সুমনা। কতরকম প্রশিক্ষণই না নিচ্ছে তারা। ওদের লক্ষ্য—সুমনাদির মতো নিজের পায়ে দাঁড়ানো।

দিদি বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। সুমনার দোকানঘরে দিদির একটা ছবি টাঙানো আছে। সুমনা মোবাইল সারাতে সারাতে মাঝে মাঝেই ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে। বলে—দিদি তোমার জন্য এমন অনেক সুমনা তৈরি করে দেব। যারা ঘরে বসে বসে মোবাইল সারাবে। সুমনা দেখে—দিদি যেন হাসছে।

নির্মল বাংলা

বাঁকুড়ার মেয়ে বিয়ে করেছিল নৈহাটির সুদিন ভট্টাচার্য। বিয়ের পর একবারই শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল বৌ নিয়ে। আর নয়।

দুটো রাত কোনোরকমে ছিল। রাত পোহালেই ভয়। খোলা মাঠে শৌচকর্ম করবে কি করে ?

শালি, শালা, শালির বরেরা, বাচ্চারা সবাই মাঠে যাচ্ছে। সুদিন পারেনি যেতে।

আজ ছেলের বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে গিয়ে অবাক। গ্রামকে গ্রাম পালটে গিয়েছে। খোলা মাঠে কত না বাড়ি। সব বাড়িতেই শৌচালয়, জল, আলো।

জীবনের অভ্যেসটাই পালটে গিয়েছে গ্রামের মানুষের। এ এক নতুন বাংলা। ভোরবেলা উঠে সুদিন হাঁটতে হাঁটতে ভাবছে—নতুন বউমাকে তাহলে নিয়ে আসা যাবে এখানে। আর লজ্জায় পড়তে হবে না।

সবুজসাথী

শুধু কি মেয়েরা পাবে, ছেলেরা সাইকেল পাবে না ? একদল ছেলে মুখ্যমন্ত্রীকেই প্রশ্ন করে বসল।

পাহাড়ি পথে পাকদণ্ডী বেয়ে বেয়ে গাড়ি চলছে। প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ মুখ্যমন্ত্রীর মনে হল সত্যিই তো, ওদের তো হাঁটতে কষ্ট হয়। ওদেরও দেব সাইকেল। নাম রাখব 'সবুজসাথী'।

নতুন পাওয়া সবুজসাথী-র সাইকেলটা মুছতে মুছতে এই গল্পটার কথা আবার মনে পড়ল বাবলার।

ভাবল, ছেলেগুলো ভাগ্যিস দিদিকে বলেছিল। ওই অচেনা ছেলেগুলোকে মনে মনে ধন্যবাদ জানাল। ওদের সাহসকেও তারিফ করল।

হুস করে নতুন সাইকেলটাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল বাবলা।

দাওয়ায় বসে বাবা সুবল জানা ভাবছে, ছোটোবেলায় কত শখ ছিল সাইকেল চালাবে। তেলকলের কাজটা পেতে একটা পুরোনো সাইকেল কিনেছিল। আজও চলছে সেটা। নতুন কেনার পয়সা আজও জোটাতে পারেনি।

স্কুল থেকে বাবলাকে সবুজসাথী-র নতুন সাইকেলটা গত সপ্তাহে দিয়েছে। ছেলের নাওয়া-খাওয়া মাথায় উঠেছে। সারাদিনই ওটাকে মুছছে, ঝাড়ছে, হাত দিয়ে দিয়ে দেখছে।

ওর মা রাগ করছে। দুদিন বাদেই পরীক্ষা। সুবল বুঝতে পারছে বাবলার আনন্দ কতটা! বউকে ডেকে সুবল বলল—দেখো এখন থেকে ছেলেটা রোজ স্কুলে যাবে। অতটা হাঁটা কি সহজ কথা ছিল।

বাবলা নাইনে পড়ে। স্কুলের মাস্টাররা বাড়িতে যেতে বলেন। বাবলা এখন তাঁদের কাছেও যেতে পারবে। কত সময়ও তো বেঁচে গেল।

বউকে বলে সুবল—এবার শহরে দিদি এলে একবার দেখতে যাব। মানুষের কষ্টের কথা কত ভাবেন তিনি। আর কত মানুষের শখ মিটছে বলো। ক্লাস নাইনে নিজের আস্ত একটা নতুন সাইকেল, ভাবা যায়!

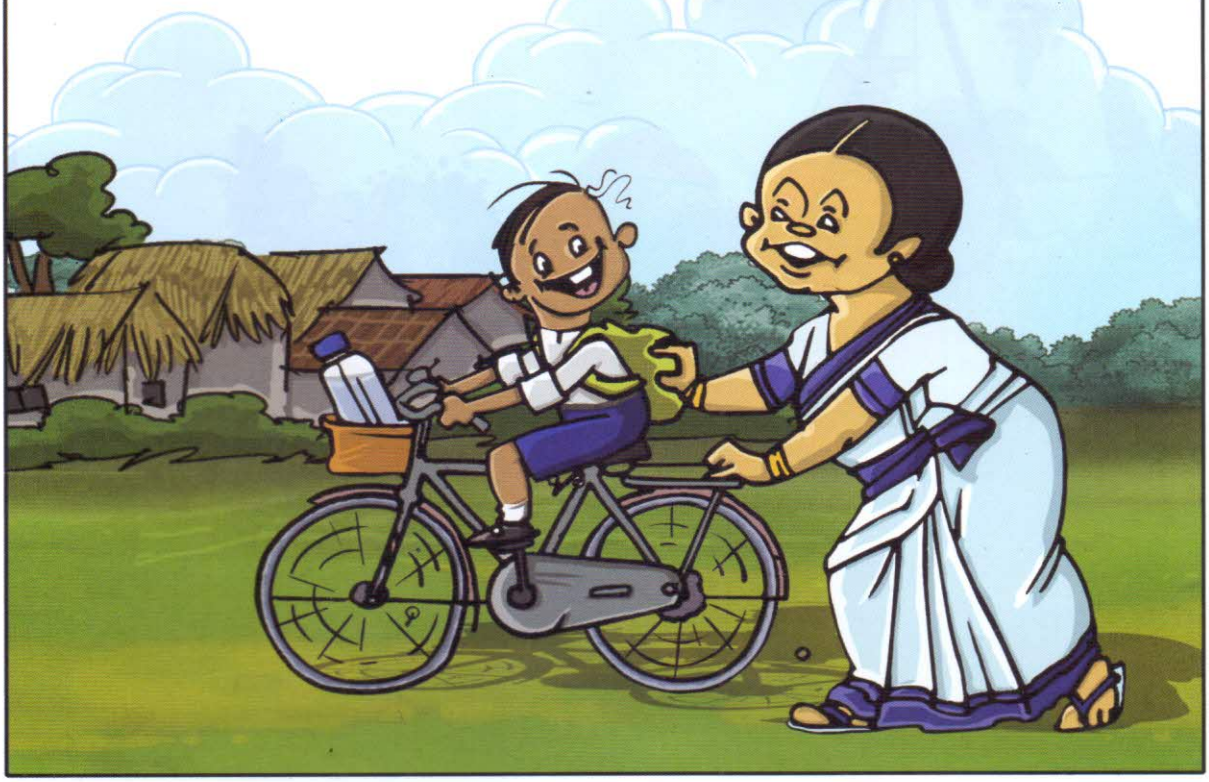

লোকসংস্কৃতিতে শেকড় সন্ধান: লোকপ্রসার

বাঘমুণ্ডির ছৌশিল্পীরা ধামসা-মাদল বাজিয়ে নাচতে নাচতে চলেছে। বৈশাখের রোদে শরীর জ্বলে যাচ্ছে, তবুও ওরা নাচছে। দু-পাশে মানুষের ভিড়। ওরা বলছে—১৮-র আগে কোনো মেয়েকে বিয়ে দিও না।

হ্যাঁ। ঠিক। ওরা বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে।

সমাজের ঘুম ভাঙাতে আজ কোমরবেঁধে নেমেছে লোকশিল্পীরা। সরকারের নানা সুযোগ-সুবিধার কথাও গানে-নাচে তারা বলছে। এর জন্য মাসে মাসে হাজার টাকা বহাল ভাতা ও প্রতি অনুষ্ঠানের জন্য হাজার টাকা করে পাচ্ছে ওরা। বৃদ্ধ শিল্পীরা পাচ্ছেন পেনশন। সরকারি অনুষ্ঠানে ওরা ডাক পাচ্ছে। সারা বছর চলছে চর্চা। লোকসংস্কৃতির মরা গাঙে নতুন জোয়ার এনেছেন দিদি—একতারা থামিয়ে বলে গেল সুবীর বাউল।

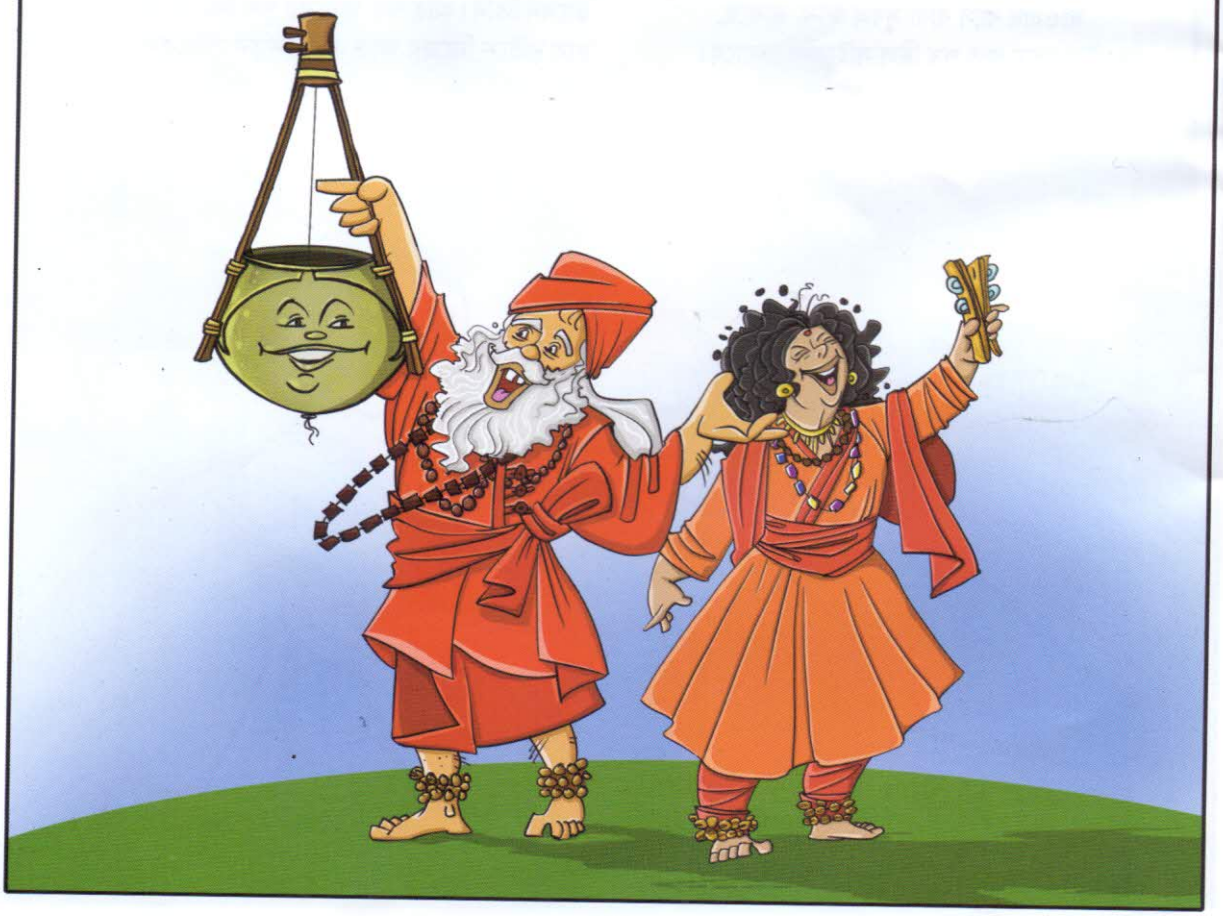

স্কুল ব্যাগ

নীল রঙের চকচকে নতুন ব্যাগ। তাতে বিশ্ববাংলার লোগো। পিঠে সেই ব্যাগ আর এক আকাশ আনন্দ নিয়ে বাড়ি ফিরছিল ওরা পাঁচজন। একই গ্রামের পাঁচ বন্ধু। সুমি, কালীপদ, চম্পা, শিবনাথ আর কালীচরণ।

শুধু ওরা পাঁচজনই নয়। সরকারি স্কুলের সমস্ত ছেলেমেয়ের জন্যই মুখ্যমন্ত্রীর উপহার এই ব্যাগ।

বাড়ি ফিরেই বাজারের ব্যাগখানা ছুঁড়ে ফেলে দিল কুশলও। না, কাল থেকে আর স্কুলের বইখাতা নেওয়ার জন্য এই বাজারের ব্যাগটার দরকার পড়বে না। এর আগে, বই-খাতা, পায়ের জুতো, স্কুল ইউনিফর্ম সবই বিনামূল্যে দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সরকার। এবার মিলল ব্যাগও। বর্ষাতেই বা চিন্তা কী? নতুন ব্যাগ যে ওয়াটারপ্রুফ!

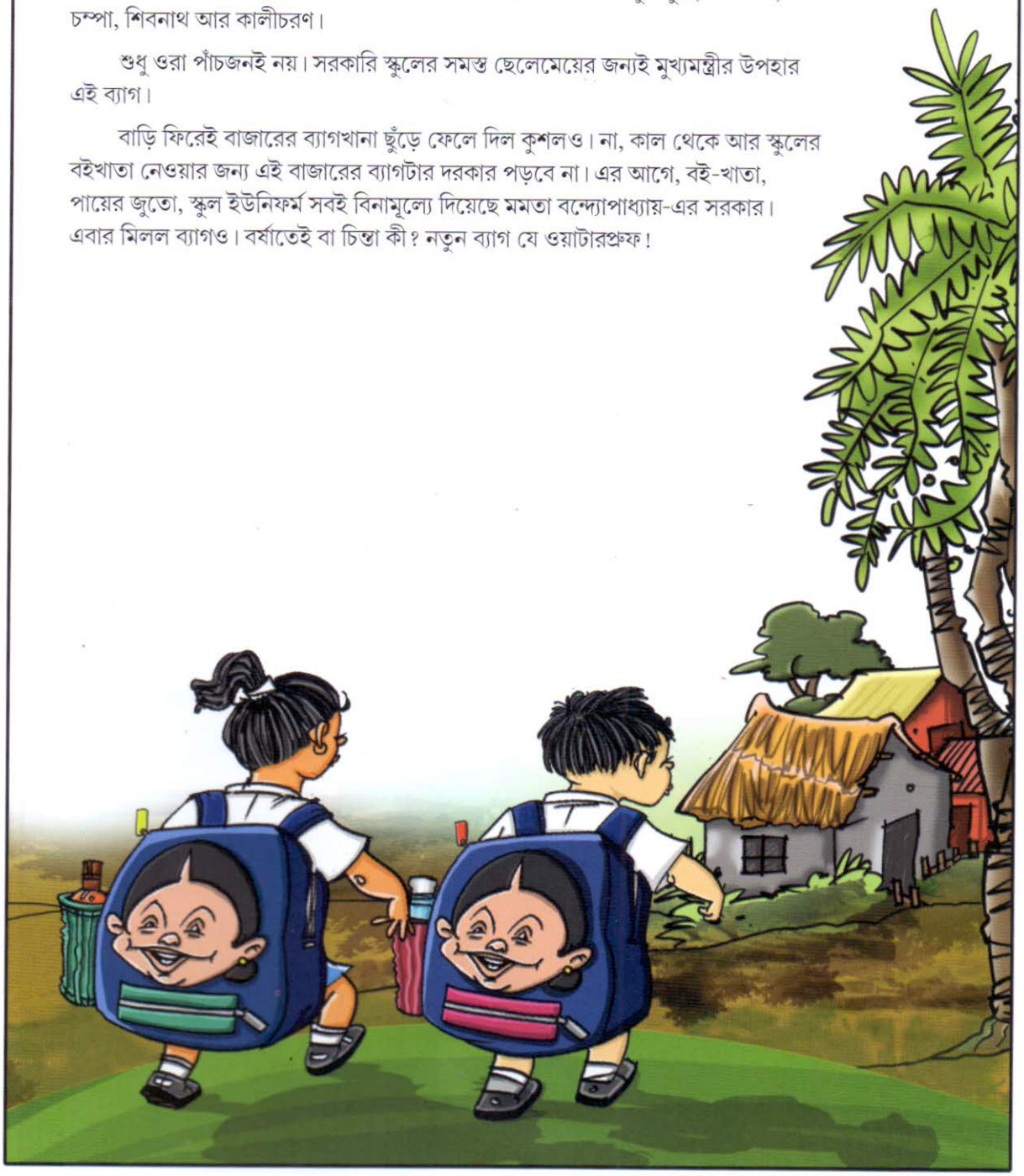

মিড ডে মিল

'আরে গরু দুটো তো রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমিয়ে গেল। ওদের একটু নদীর ধারে ছায়া দেখে কচি ঘাসে বেঁধে দিয়ে আয়।' কে যাবে? কেন? —জগন্নাথ

রেশনে চাল আটা 'ধরতে' হবে—কে যাবে? কেন? —জগন্নাথ

'ঘরে জল লাগবে। রাস্তার কল থেকে দু-বালতি ভরে আনো।' কে যাবে? কেন? —জগন্নাথ

বাড়ির যে কোনও কাজেই ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো—জগন্নাথ।

বয়স এগারো। তবু, সে না থাকলে সংসার টলোমলো। সে স্কুলে গেলে চলবে কেন? তাই ঘুচে গেল জগন্নাথের স্কুলের পাঠ। একজন দু-জন নয়, ঘরে ঘরে এমন হাজারো জগন্নাথ।

আগে তো বাড়ির কাজ। দুটো খাবার জোগাড়। তারপর সময় পেলে পড়াশোনা।

এই জগন্নাথদেরই হাত ধরে স্কুলে ফেরত আনলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তাদের সামনে ধরলেন একথালা গরম ভাত। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যাদের শিখিয়ে দিলেন কীভাবে মায়ের মমতা দিয়ে সযত্নে প্রতিটি বাচ্চার খাবার বানাতে হয়।

মিড ডে মিল আজ তাই স্কুলের বাচ্চাদের অধিকার।

শিক্ষাশ্রী

একে পিছিয়ে পড়া পরিবারের সন্তান, তার উপরে শ্রেণিতে ওঠার ঠিক পরে পরেই বাবাকে হারাল প্রসাদ। তাহলে কি আর পড়াশোনা হবে না? ঠিক এই সময় অভিভাবকের মতোই এগিয়ে এল এ রাজ্যের সরকার। বছরে সাড়ে সাতশো টাকা তপশিলি জাতির ক্ষেত্রে পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য আর বার্ষিক ৮০০ টাকা হারে অষ্টম শ্রেণির জন্য। তপশিলি উপজাতি পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য গড়ে বছরে ৮০০ টাকা।

তা-ই বা কম কি? বইখাতা স্কুলের পোশাক, ব্যাগ, জুতো—প্রায় সবকিছুই হাতে তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবু যদি কোথাও এতটুকু ঘাটতি থেকে যায়? সেই সম্ভাবনা আটকাতেই শিক্ষাশ্রী। টাকা সরাসরি চলে এল প্রসাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে।

বাবার হাত সরে গেলেও পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবে সে—এত বড়ো ভরসার জায়গা আর কোথায়?

মুক্তির আলো

অল্প বয়সের ভুলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল স্বর্ণালী বিশ্বাস। তার জন্য অনেকটা মূল্য দিতে হয়েছে ওকে। মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ওকে পাচার করে দিয়েছিল ভিন রাজ্যে। অনেক কষ্টে মুক্তি মিলেছে। ঠাঁই হয়েছে একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে। সরকারের খরচে থেকে, খেয়ে, প্রশিক্ষণ নিয়ে সেখানেই ব্লক প্রিন্টিং-এর কাজ করছে।

বিয়েও হয়েছে স্বর্ণালীর। শ্বশুরবাড়ির কোনও আপত্তি নেই। মাস গেলে এখন ওর হাতে আসছে মোটা টাকা। দূর দূর দেশে চলে যাচ্ছে ওদের হাতের তৈরি শাড়ি, পোশাক, ব্যাগ। প্রতিষ্ঠানের প্রধান ওদের সকলের মাসিমণির ভালবাসায় ওরা সুস্থভাবে বেড়ে উঠেছে। ওরই মতো কত দুর্ভাগা মেয়েরা আজ স্বনির্ভর হয়ে উঠছে সরকারের সাহায্যে। মমতাদিই এই প্রথম ওদের মতো মেয়েদের কথা ভাবলেন। 'মুক্তির আলো' নামটা দিদিরই দেওয়া। এই প্রকল্পেই ওরা অন্ধকার থেকে আলোয় ওদের মুক্তি খুঁজে নিচ্ছে।

রোজ ভোরে উঠে একবার দিদির মুখটা মনে পড়ে স্বর্ণালীর। সত্যি করেই মুক্তির আলো এসেছে জীবনে।

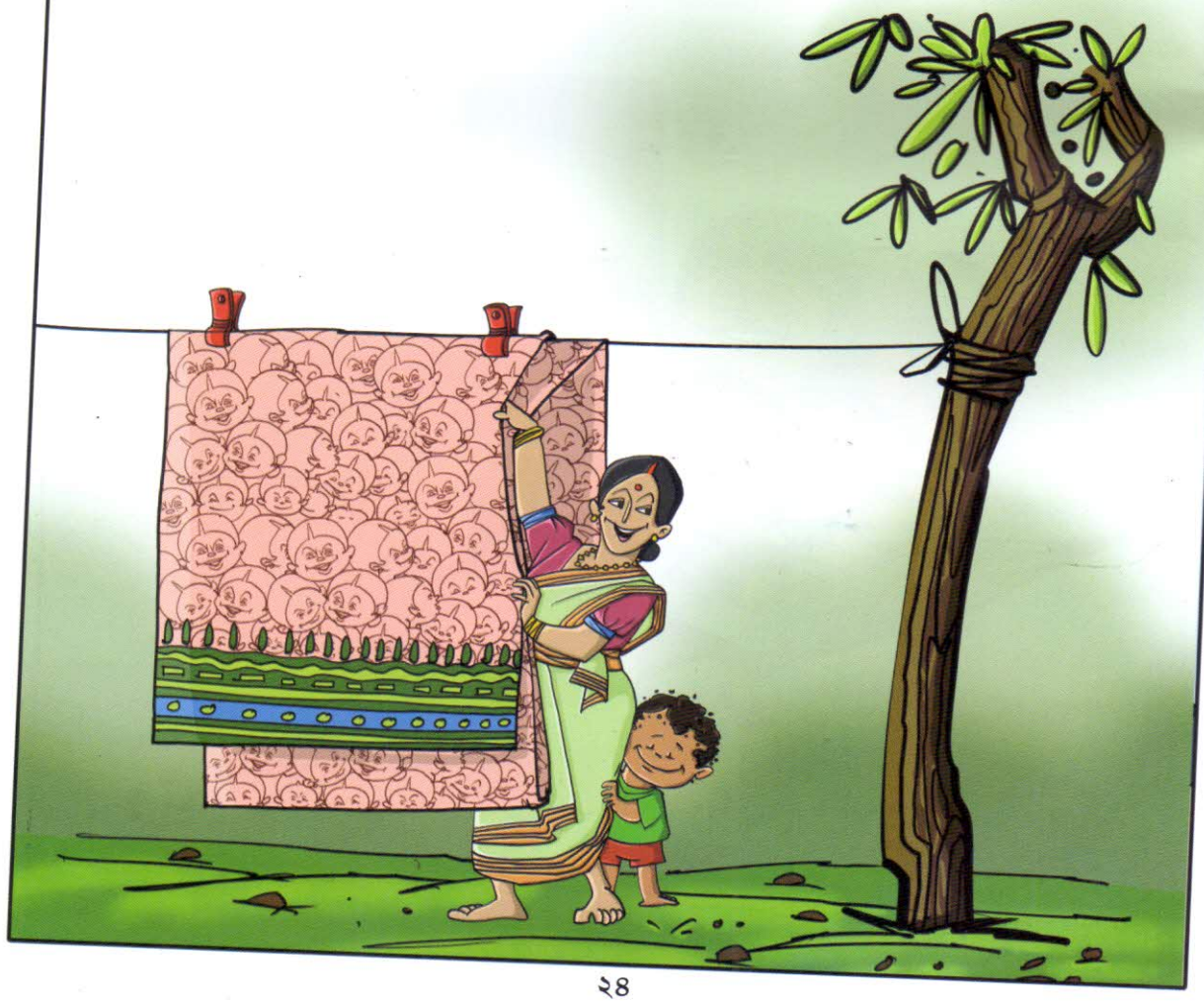

সবলা

গরিব ঘরের মেয়ে সুমতি। বাবা জনমজুরের কাজ করেন। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে ওই বড়ো। আধপেটা খেয়ে খেয়ে শরীরের বাড়বাড়ন্ত থেমে আছে। মা মাঝে মাঝে দুঃখ করেন। বয়স হচ্ছে। বিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এই কঙ্কালসার চেহারা। বিয়ে করবে কে? খাটতেও তেমন পারে না। স্কুলের পড়াটাও চালাতে পারেনি।

অঙ্গনওয়াড়ির দিদি একদিন ষোড়শী সুমতিকে 'কিশোরী কার্ড' দিয়ে গেলেন। ওর শরীর-স্বাস্থ্য, হাতের কাজ শেখানো এসবের জন্য নাকি এখন থেকে সরকারই দায়িত্ব নেবে।

সুমতির মনে খুশি ধরে না। আবার সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ শেখা। স্কুল বন্ধ হওয়ায় বহুদিন মনটা খারাপ ছিল।

ওর মতো টিঙ্কু, ফুল্লরা, আসমিনা সকলের জন্য ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে পুষ্টিযুক্ত খাবার। হাতের কাজও শিখছে। সুন্দরভাবে বাঁচতে হবে—ঘরে, বাইরে সর্বত্র। কত যত্নে দিদিরা তা শেখাচ্ছেন।

সুমতির মা ভাবতে শুরু করে—দু-বছরেই মেয়ে এবার ডাগরটি হয়ে উঠবে। আর চিন্তা নেই তাঁর।

স্বাবলম্বন স্পেশাল

ছোটবেলা থেকেই সিনেমা, সিরিয়ালে অভিনয়ের স্বপ্ন দেখত বগুলার শিল্পী। সেই লোভেই পাড়ার দাদার হাত ধরে বম্বে পাড়ি দেওয়া। তারপর? অন্ধকারের রাজ্যে চলে যাওয়া। অনেক কষ্টে এ রাজ্যে ফিরেছে। এখন পেশাদার যৌনকর্মী। ঘরে ফেরার আর সুযোগ হয়নি তখন।

শিল্পীর তবে আর দুঃখ নেই। ও এখন নিয়মিত সিরিয়ালে অভিনয় করছে। সরকার ওদের প্রশিক্ষণ ও সুযোগ দিয়েছে। নামীদামি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে ওর কাজ চলে।

এত পথ ঘুরে অবশেষে শিল্পীর ইচ্ছাপূরণ হল দিদির এই প্রকল্পের জন্য। নামটাও সার্থক—'স্বাবলম্বন স্পেশাল'। মাসে মাসে অসুস্থ মাকে টাকা পাঠায় শিল্পী। অভিনয়ের টাকা। বাড়ির লোক আর আপত্তি করে না।

মানবিক

৮৫ শতাংশ প্রতিবন্ধকতা নিয়েও পিকলু এগিয়ে চলেছে। এদের এগিয়ে দিতেই দিদি চালু করেছেন 'মানবিক'।

হঠাৎই বাপ্পা এসে বলল পিক্‌লুর মাকে ওর সার্টিফিকেটটা নিয়ে পৌরসভায় যেতে। মাসে মাসে এক হাজার টাকা করে দেবে। ৫০ শতাংশের উপর প্রতিবন্ধকতা যাঁদের আছে তাঁদের এই টাকা দেওয়া হবে। তাঁরা প্রতিবন্ধী ভাতা নিয়মিতভাবে পেয়ে থাকলেও অতিরিক্ত ভাতা হিসাবে এটি পাবেন।

আবছা অন্ধকারেও দূর থেকে দেখলেই বোঝা যায় পিক্‌লু আসছে। পুরো শরীরটা বেঁকেচুরে হাঁটে। চোখেও ভালো দেখে না। মাধ্যমিকটা কোনোরকমে পাশ করেছে। পিক্‌লুর বাবা নেই সাত বছর হল। মা-ই টেনে টেনে এত বড়ো করল। মায়ের ইচ্ছে ছেলেকে আইটিআই থেকে হাতের কাজ শেখাবে। কিন্তু পয়সার অভাব। দোকানের কাজটা তাহলে মাকে ছাড়তে হয়। ওকে আনা-নেওয়া তো করতে হবে মাকেই।

সব সমস্যার সমধান করে দিল 'মানবিক'।

পিক্‌লুর মায়ের যেন চোখে জল এসে গেল।

রূপশ্রী

নাকটা একটু বোঁচা। আদর করে ছোট থেকেই বাড়ির সবাই ওকে বোচন বলে ডাকে। লক্ষ্মীশ্রী গড়ন। পাত্রপক্ষের লোক এসে পছন্দ করে। কিন্তু বিয়ে দেওয়ার পয়সা নেই। বাপ-মা মরা মেয়েটা কাকার বাড়িতে থাকে। পড়াশোনাও তেমন করতে পারেনি। পরের গলগ্রহ। দিনরাত হাড়ভাঙা খাটুনি। বিনিময়ে থাকা, খাওয়া, নিরাপত্তা।

পাড়ার বউদিরাই এগিয়ে এল এবার। পাড়ার ছেলে বুকনের সঙ্গে বিয়ে দেবে বোচনকে। বুকনের বাড়ির সামনে ছোট্ট চায়ের দোকান। বোচন বিয়ের জন্য রূপশ্রীর পঁচিশ হাজার টাকা পাবে। ওই টাকা দিয়ে চায়ের দোকানের সঙ্গেই খাবারের দোকান করবে। দিনের বেলায় ভাত-ডাল-তরকারি। রাতের বেলায় রুটি-তড়কা। বুকনের মাও হাত লাগাবেন বলেছেন।

হয়তো সামান্য কটা টাকা। কিন্তু ওই টাকাই কত মানুষের জীবন বদলে দেবে। বোচন আর বুকন এই কথাই বলছিল।

রূপশ্রীর পাওয়া টাকায় ওরাও ওভাবেই ওদের নতুন জীবন গড়ে নেবে। পাড়ার মন্দিরেই সকলে ওদের বিয়ে দেবে বলে ঠিক করেছে। অযথা পয়সা নষ্ট নয়।

সব সমস্যার সমধান করে দিল 'মানবিক'।

পিক্লুর মায়ের যেন চোখে জল এসে গেল।

স্বাস্থ্যসাথী

রাজ্যের সব হাসপাতালগুলোতেই এখন মানুষ বিনা পয়সায় চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছে। ন্যায্য মূল্যে ওষুধ পাওয়ায় কত মানুষ আজ কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা করাতে পারছে। গ্রাম-গঞ্জের পাশাপাশি কত বড়ো বড়ো হাসপাতাল গড়ে উঠেছে। গরিব মানুষেরা কোনোদিন ভাবতে পারেনি, ওসব হাসপাতালে তারা ঢুকতে পারবে।

আজ স্বাস্থ্যসাথীর জন্য বড়ো বড়ো নার্সিংহোমেও তো তারা যাচ্ছে, চিকিৎসা করাচ্ছে।

এসব কি আগে কেউ ভেবেছিল?

সবই হল দিদির জন্য। রাজ্যের সবাই ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক—এটাই তিনি চান। আর তাই এত আয়োজন।

এই যেমন রসুলপুরের জীবন ঘোষাল।

জীবন ঘোষাল টের পেয়েছেন যে বিপদের দিনের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু। আর 'স্বাস্থ্যসাথী'-ই আজ বাংলার মানুষের 'প্রকৃত বন্ধু'-র জায়গা নিয়েছে। অসুখ করলে ধনী-নির্ধন সকলেরই একই অবস্থা হয়। টাকা থাকলে চিকিৎসা করার সুযোগ নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যাঁদের টাকা নেই তাঁরা কি মরে যাবেন বিনা চিকিৎসায়?

তা হয় না। তাঁদের জন্য সরকার আছে। জীবনবাবু তাঁর নিজের জীবন দিয়েই তো বুঝলেন।

বউমার 'স্বাস্থ্যসাথী'-র কার্ডেই তো জীবনবাবুর চিকিৎসা চলল, হার্টের অপারেশনটা হল। এখন তিনি সুস্থ। আবার ছোটো পান-বিড়ির দোকানটা চালাচ্ছেন একাই।

বউমা মিড-ডে মিলের রান্না করে গার্লস স্কুলে। একসময় এতে জীবনবাবুর খুব আপত্তি ছিল।

নার্সিংহোমে গিয়ে তো দেখলেন কতো ভালো ভালো পরিবারের মানুষরাও 'স্বাস্থ্যসাথী'-র আওতায় চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ হচ্ছেন। এতটা জানা ছিল না জীবনবাবুর।

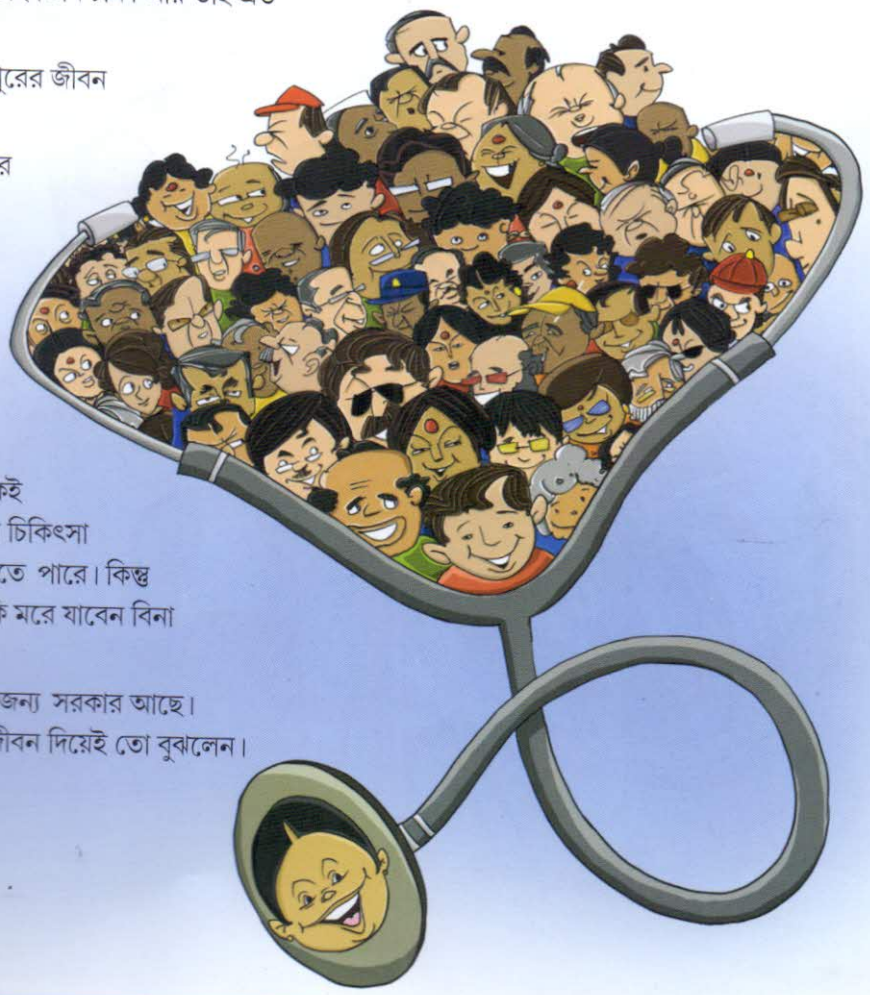

শিশুসাথী

রিকশা বিক্রি করে দু-মাস আগে টোটো কিনেছে দুলাল। পয়সা আসছে তবু ছেলেটার চিকিৎসার জন্য সবই বেরিয়ে যাচ্ছে। তিন বছরের বাচ্চা। হার্টের সমস্যা। বড়ো ডাক্তার বলেছে, অপারেশন করাতে। সরকার নাকি টাকা দেবে। দুলালের বৌ সব খোঁজ নিয়ে এসেছে। 'শিশুসাথী' নামে দিদি এইরকম বাচ্চাদের জন্য একটা কি যেন চালু করেছে। ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত ওদের চিকিৎসার সব খরচ দেবে সরকার। মমতা দিদিই নাকি এটার ব্যবস্থা করেছেন।

দুলালকে যেতে হবে জেলা হাসপাতালে, পুরসভায়। কাজ ফেলে রেখে আগে এই দৌড়ঝাঁপগুলো করতে হবে। ওরা তো ভেবেছিল, ছেলেটাকে তিলে তিলে মরে যেতে দেখবে চোখের সামনে। কোনো আশাই ছিল না ওর সুস্থ হয়ে ওঠার।

'শিশুসাথী' যেন ওদের নতুন করে বাঁচতে শক্তি জোগাচ্ছে। দিদির জন্যই দুলালরা তিনজন আবার বাঁচার লড়াই শুরু করছে।

সমাজসাথী

পার্বতীও দল করে। স্বনির্ভর দল। স্কুলে স্কুলে ইউনিফর্ম সাপ্লাই করে। দাদার স্কুটি নিয়ে মাঝে মাঝেই কাজে বেরোয় দলনেত্রী পার্বতী। হঠাৎই দুর্ঘটনা। অটো-রিকশার সঙ্গে ধাক্কা। কোমরে এমন চোট লাগল নার্সিংহোমে থেকে বিরাট অপারেশন করাতে হল। সমাজসাথীর স্বাস্থ্যবিমার জন্য অনেকটা টাকাই পেল।

পাড়ার বউদিরা বলল, স্বনির্ভর দল আমরাও গড়ব পার্বতী। তোমাকে দেখেই শিক্ষা হল। স্বাস্থ্যসাথীর টাকাও পেলে, আবার সমাজসাথীর হেল্‌থ পলিসির টাকা।

পার্বতীকে দেখে এভাবেই এগিয়ে আসছে ওদের পাড়ার মেয়ে-বউরা।

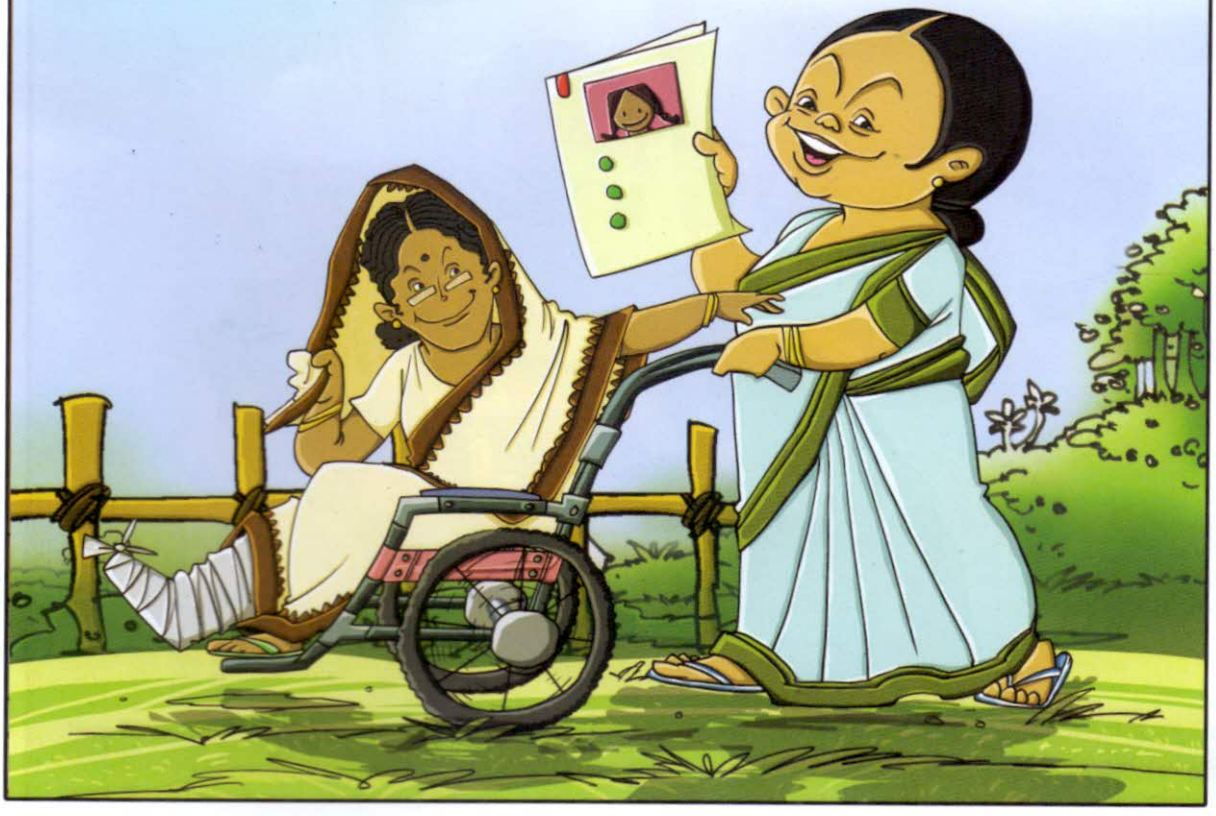

সামাজিক সুরক্ষা যোজনা

রং-এর কাজ করতে গিয়ে লাটাই-এর ওই যে পা ভাঙল আর ঠিক হল না। অভাবের সংসারে লাটাই ছিল একমাত্র রোজগেরে। ছোটোভাই নাটাইকে কাজেই হাত দিতে হল। মায়ের বড়ো আপত্তি।

নাটাই মাকে বলল—অতো ভেব না। সরকার আছে ভাবার জন্য। খেটে খাব। সরকারও তো আমাদের কথা ভাবে।

একসময় ছবি আঁকত নাটাই। রং, তুলি কেনার পয়সা জুটত না। বাধ্য হয়ে ছেড়ে দিল আঁকা। আবার সেই রং নিয়ে শুরু হল জীবনের পথ চলা। কলেজপড়ুয়া নাটাই জানে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি অনেক সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।

সেই ভরসাতেই নাটাই রং-এর কাজে নেমে পড়ল।

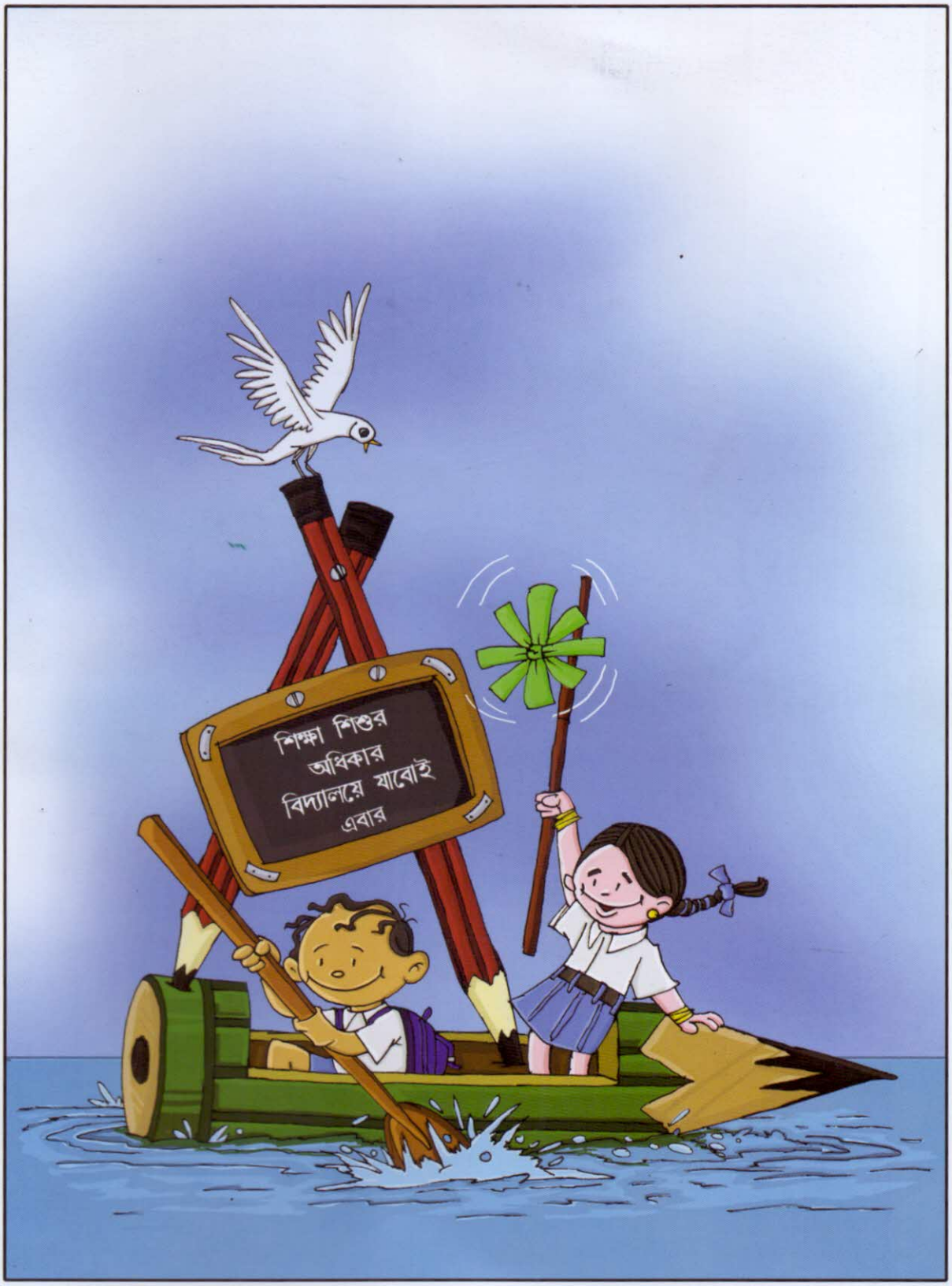
শিক্ষা শিশুর
অধিকার
বিদ্যালয়ে যাবোই
এবার